ভূমিকা

লোকসংস্কৃতির প্রতি ছাত্র অবস্থা থেকেই আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। পরবর্তীকালে স্নাতকোত্তর স্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময় দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলি পাঠ করে লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রতি আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ঘটনাক্রমে একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (১ম খণ্ড) শিরোণামে ফুটপাতে পড়ে থাকা ধূলিমলিন একটি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত বইটি খুলতেই 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালা দেখে আগ্রহান্বিত হয়ে বইটি কিনলাম। বইটি পড়তে বসে মোহগ্রস্তের মতো আবিষ্ট হয়ে পড়লাম এবং কয়েকদিনের মধ্যে বইটির অন্তর্গত ৬টি পালা পড়ে ফেললাম। পালাগুলিতে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান দেখে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্যান্য খণ্ডগুলির অন্বেষণে মনোনিবেশ করলাম। এর পর থেকে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যান্য বিষয়ে আমার আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কর্মজীবনে প্রবেশ করে সেই বিষয়কে পূর্ণরূপ দিতে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নিয়ে আমার এই গবেষণা কর্ম শুরু হয়।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সংগ্রাহক ও সম্পাদক সম্পর্কে শুরুতে দু-একটি কথা বলি, শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফরিদপুর জেলার পাংসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় মৌলিক মহাশয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অগ্নিযুগের বিখ্যাত নেতা পুলিন দাসের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের গুপ্ত সমিতিতে মনিরায় নামে সভ্য হন। তৎকালীন পুলিশ তাঁকে বিপ্লবী বন্দী হিসাবে সুদূর বক্সা বন্দী শিবিরে কয়েকবছর অন্তরীন করে রেখেছিল। এরপর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বিপ্লবী বন্দীদের হাতে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিহত হলে মনিরায় কে ধরবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। এইসময় মৌলিক মহাশয় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হন। অবশেষে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবী দলের সংস্রব ত্যাগ করে মৌলিক মহাশয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠক বৃত্তি গ্রহণ করে পাকাপাকি ভাবে পূর্ববঙ্গে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে তা ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৌলিক মহাশয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যত্নসহকারে পাঠ করে দেখলেন, অধিকাংশ পালাই অসম্পূর্ণ, পালার অনেকস্থানে একজনের উক্তি অন্যজনের মুখে বসানো হয়েছে, অনেকগুলো গানের শব্দসজ্জা ও বানানে সমস্যা আছে। এই সমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় বক্সা বন্দী শিবির থেকে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়কে কয়েকবার পত্র ও লিখেছিলেন কিন্তু কোনো উত্তর পান নি।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশের তিন বছর পর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রথম খণ্ড, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয়খণ্ড এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলি পাঠ করে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, যদি সময় ও সুযোগ পান তাহলে তিনি নিজেই পালাগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করবেন। কিন্তু নানা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকবার কারণে তিনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সে সময় ও সুযোগ পাননি।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পালা সংগ্রহ করতে গিয়ে দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত পালাগুলি

কেন এত ত্রুটিপূর্ণ মৌলিক মহাশয় তা উপলব্ধি করলেন। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে কোনো পালা সংগ্রহ করেন নি। পালা সংগ্রাহকগণ যে পালাগুলি সংগ্রহ করেছেন সেগুলির অ-কার, ই-কার পরিবর্তন না করে, পালাগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা অনুসন্ধান না করে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় যথাবৎ ছাপিয়ে দিয়েছেন। সেন মহাশয়ের পালা সংগ্রাহকগণ গায়েনদের মুখ থেকে শুনে পালাগুলি লিখে নিয়ে ছিলেন। তারা কেউই বয়াতি বা গায়েনদের কোনো লিখিত খাতা পাননি। সেকারণে দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত পালাগলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা, সামঞ্জস্যহীনতা, পূর্বাপর ঘটনার যোগসূত্রের অভাব ও বানান বিভ্রাট পরিলক্ষিত হয়।

মৌলিক মহাশয় ও পালা সংগ্রহের পূর্বে ভেবেছিলেন তিনিও হয়তো কোনো লিখিত পালাগানের সন্ধান পাবেন না। কিন্তু পালা সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌলিক মহাশয় দেখলেন, অধিকাংশ পালা গায়করা হিন্দু এবং আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন। গায়েনরা যেসব পালাগান গাইতেন সেগুলির লিখিত খাতা ও তাদের কাছে থাকত। একমাত্র শিষ্য বা কোনো আপনজন ছাড়া গায়েনরা কাউকে পালার খাতা দেখাতেন না। মৌলিক মহাশয় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ভাগবত পাঠ করতেন বলে অনতিবিলম্বে তিনি গায়েনদের গুরু হয়ে উঠেছিলেন। ফলস্বরূপ গায়েনদের কাছ থেকে লিখিত খাতা পেতে তাঁর কোনো অসুবিধায় পড়তে হয় নি। পালা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মৌলিক মহাশয় কোনো সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন নি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে মৌলিক মহাশয় গায়েন ও বয়াতিদের খাতা থেকে পালাগুলি সংগ্রহ করেছেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মৌলিক মহাশয় পালা সংগ্রহের কাজে এমন নেশাগ্রস্তের মতো মেতে ছিলেন যে পালাগুলি কীভাবে ছাপিয়ে প্রকাশ করবেন সে চিন্তা বিশেষ করেন নি। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তখন তিনি তাঁর এই সুদীর্ঘকালের সাধনায় সংগৃহীত পালাগুলি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করবার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। কিন্তু মৌলিক মহাশয় আর্থিক দিক থেকে এতটাই অস্বচ্ছল ছিলেন যে, এই গ্রন্থ ছাপানোর অর্থ সঙ্গতি তাঁর ছিল না। মৌলিক মহাশয় মনে মনে আশা করেছিলেন যে, দীনেশ চন্দ্র সেনের সংগৃহীত পালাগুলি যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন, তেমনি তাঁর সংগৃহীত পালাগুলি ও অন্যকোনো প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করবেন। কিন্তু একটানা পাঁচবছর সংগৃহীত পালাগুলি প্রকাশের জন্য মৌলিক মহাশয় বিভিন্ন স্থানে ঘুরে উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর ধারণা ভ্রান্ত। এরপর ও ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সংগৃহীত পূর্ববঙ্গের পালাগুলি প্রকাশের ব্যাপারে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো সহৃদয় ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। মৌলিক মহাশয়ের বয়স ও সত্তর অতিক্রম করেছে। প্রবল এক হতাশায় মৌলিক মহাশয় যখন একপ্রকার দিশাহীন ঠিক তখনই মানবিকী বিদ্যায় ভারতের জাতীয় অধ্যাপক, ভারতীয় সাহিত্য একাডেমির সভাপতি মাননীয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্য তাঁর জীবনে দেবতার আশীর্বাদ রূপে নেমে এল। অবশেষে সুনীতি কুমার চট্টোপাধায়ের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থ সাহায্যে এবং ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় - ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত সাত খণ্ড 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হল।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত সাত খণ্ডে প্রকাশিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র আটচল্লিশটি পালার অভ্যন্তরে যে সমস্ত লোকসংস্কৃতির উপাদান লুক্কায়িত অবস্থায় আছে, সেগুলি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজে বের করে লোক ঐতিহ্যের ধারায় কিভাবে উপাদানগুলি বংশ পরম্পরায় লোকমুখে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান

কালের ধারা পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে সম্পর্কে প্রসঙ্গ সহ পর্যালোচনা করাই আমার গবেষণা কর্মের মূল উদ্দেশ্য।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল মহাশয়। তিনি সর্বদাই প্রশাসকের ভূমিকায় তাগাদা দিয়ে আমার গবেষণা কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রতি রইল আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক - অধ্যাপিকাকে আমার হার্দিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। তাঁদের আন্তরিক পরামর্শ ও সাহচর্য ব্যতিরেকে এই গবেষণা কর্ম বাস্তব রূপ পেত না। এছাড়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সত্যবতী গিরি মহাশয়াকে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সনৎ কুমার নস্কর মহাশয়কে। তাঁদের কাছে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' যে গবেষণা কর্মের বিষয় হতে পারে অধ্যাপক সত্যবতী গিরি মহাশয়া সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেন। আর অধ্যাপক সনৎ কুমার নস্কর মহাশয় আমাকে সর্বদাই সুপরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার গবেষণা কর্মের কাজকে তরান্বিত করেছেন।

সর্বোপরি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণমিশন গ্রন্থাগার - এর সহযোগিতা ছাড়া আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করত না। সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

——